লোক প্রশাসন সাময়িকী
৯ম সংখ্যা, জুন ৯৭, আষাঢ় ১৪০৪

বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার সন্ধান

মোশাররফ হোসাইন ভূইঞা *

ভূমিকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে,

"আমরা, বাংলাদেশের জনগণ, ১৯৭১ খীষ্টাব্দের মার্চ মাসের ২৬ তারিখে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া জাতীয় স্বাধীনতার জন্য ঐতিহাসিক যুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন ও সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি।"

প্রস্তাবনায় আরও বলা হয়েছে, "আমাদের রাষ্ট্রের অন্যতম লক্ষ্য হইবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এমন এক শোষণমুক্ত সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রতিষ্ঠা-যেখানে সকল নাগরিকের জন্য আইনের শাসন, মৌলিক মানবাধিকার এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য, স্বাধীনতা ও সুবিচার নিশ্চিত হইবে।"

সংবিধান দেশের জনগণের আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন এবং রাষ্ট্রপরিচালনার সর্বোচ্চ আইন। এটি স্বাধীন জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের সামষ্টিক পরিস্থিতির আইনগত ভিত্তি। কিন্তু আইনের পেছনেও রয়েছে ইতিহাস–যে ইতিহাস বাংলাদেশের জনগণকে স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বায় বিকশিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আইনগত অর্থে এ জাতির জন্ম ১৯৭১ সনে হলেও বাংলাদেশের জাতিসত্তার মূল অনেক গভীরে প্রোথিত। বলা যায়, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশের মাধ্যমে আমাদের জাতিসত্ত্বা পরিণতি লাভ করেছে।

জাতিসত্ত্বার ধারণা

বাংলা ভাষায় 'জাতি' শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। বক্ষ্যমাণ আলোচনায় এটি ইংরেজী 'Nation' শব্দটির সমার্থক। অপরদিকে 'সত্ত্বা' মানে বলা হয় অস্তিত্ব, বিদ্যমানতা, নিত্যতা ইত্যাদি। সুতরাং 'জাতিসত্ত্বা' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় 'nation বা জাতি হিসেবে অস্তিত্ত্ব। জাতি হিসেবে বাংলাদেশের মানুষের অস্তিত্ত্বের উৎস অনুসন্ধানই এ আলোচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

জাতি হিসেবে আমাদের সত্ত্বা, কিংবা সাধারণভাবে মানুষের জাতিগত বিন্যাস অনেক পুরনো হলেও জাতি, জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ প্রভৃতি ধারণা অবশ্যই বর্তমান যুগের। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক ইউরোপে প্রথম এ ধারণা বিকশিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর স্বকীয়তাবোধ

---

* অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক, ময়মনসিংহ

জোরদার হয়। সেই সঙ্গে এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমান্বয়ে ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হতে থাকে। এ সময় নব্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলোর জনসাধারণের মধ্যে সুগভীর জাতীয়তাবোধ লক্ষ্য করা যায়। এ সকল দেশের মুক্তিসংগ্রামে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাঁদের অধিকাংশই জাতীয়তাবাদী নেতা হিসেবে পরিচিত হন। প্রকৃতপক্ষে জাতিগত চেতনা এসব দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে।

জাতিসত্ত্বা, জাতীয়তাবোধ, জাতীয়তাবাদ এগুলো মূলত মরমী প্রপঞ্চ। এর সঙ্গে মানুষের অনুভূতির প্রশ্ন জড়িত থাকে। মানুষের পরিচিতির বিভিন্ন মাত্রা (dimension) থাকে; এটি ব্যক্তির বেলায় যেমন প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য সমষ্টির ক্ষেত্রে। জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রেও এ বহুমাত্রিকতার প্রশ্নটি পরিহার করা দুষ্কর। এ প্রসঙ্গে খুশবন্ত সিং-এর খ্যাতনামা রচনা Why I Am An Indian থেকে উদ্বৃতি দেয়া যেতে পারে।

" Are you an Indian first and a Punjabi or Sikh Second? Or is it the other way round? I don't like the way these questions are framed and if I am denied my Punjabiness or my community tradition, I would refuse to call myself Indian. I am Indian, Punjabi and Sikh."

এ বহুমাত্রিকতা সত্ত্বেও জাতিগত পরিচিতির একটি মৌলিক উপাদান থাকে, যা একটি জনগোষ্ঠিকে এক সূত্রে গ্রথিত করে। সে মৌলিক উপাদান হতেই সৃষ্ট হয় জাতীয় চেতনা ও জাতীয়তাবোধ–যা দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের মূল প্রেরণা। এ মৌলিক উপাদানও বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্ন দেশে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে ভিন্ন হতে পারে; কিন্তু এর সুদূরপ্রসারী প্রভাবকে অস্বীকার করার উপায় নেই।

Hans Kohn তাঁর Nationalism: Its meaning and History গ্রন্থে লিখেছেন, বর্তমান যুগে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে nation-state এর ভিত্তিতে যে জাতিসত্ত্বা গড়ে উঠেছে, সেখানে আনুগত্যের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ আনুগত্য অবশ্যই স্বতস্ফুর্ত এবং অনেকগুলো ব্যাষ্টিক অনুভূতি ও আনুগত্যের সমন্বয়েই গড়ে ওঠে একটি জাতিগত পরিচিতি।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন সময়ে জাতিসত্ত্বার বিভিন্ন উপাদান লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নৃতাত্ত্বিক, ভাষাতাত্ত্বিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক প্রভৃতি। একটি দেশের সকল মানুষের মধ্যে এ সবগুলো উপাদান বিদ্যমান থাকবে, এটি অকল্পনীয়। প্রকৃতপক্ষে এগুলোর মধ্যে এক বা একাধিক উপাদানের অভিন্নতা কিংবা প্রাধান্য একটি জাতির বিকাশে কার্যকর ভুমিকা পালন করতে পারে।

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপট

উপর্যুক্ত উপাদানসমূহের আলোকে যদি বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ভাষাতাত্ত্বিক উপাদানই বেশী কাজ করেছে। তার আগে ১৯৪৭ সনে ভারত-বিভাগ

তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পেছনে সক্রিয় ছিল ধর্মীয় অনুভূতি। তারও আগে অবিভক্ত ভারতে জাতিসত্ত্বা বিকাশের পশ্চাতে ভাষাগত কিংবা ধর্মীয় চেতনা কোনটিই মৌলিক উপাদান ছিল না। ভারতে আগেও অনেক ভাষা ও ধর্মের লোক বসবাস করেছে এবং এখনো করছে।

জাতি হিসেবে বাঙ্গালীর ইতিহাস অনেক পুরনো। বাংলা ভাষার ইতিহাসও অনেক দিনের। কিন্তু স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। এ অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে ভাষাগত চেতনা প্রধান প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। এ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েই এদেশের মানুষ সচেতন হয়েছে নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্পর্কে। ভাবতে প্রণোদিত হয়েছে জাতিসত্ত্বার অন্যান্য উপাদান সম্পর্কে।

প্রাচীন বাংলার মানচিত্র

বর্তমানে যারা বাংলাদেশের অধিবাসী বলে পরিচিত, তারা সবাই অভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক নয়, একথা প্রায় সর্বজনবিদিত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে এ জাতি গঠিত হয়েছে। দূর অতীতে এ জনগোষ্ঠীর অধিকাংশই ছিল কোমবদ্ধ এবং শত শত বছর যাবৎ তারা কোম জীবনেই অভ্যস্ত ছিল। প্রতিটি কোম আলাদা আলাদা জায়গা নিয়ে মোটামুটি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবন যাপন করত, অন্যান্য কোমের সঙ্গে যোগাযোগ বড় একটা ছিল না। এ পর্যায়ে বৃহত্তর জনচেতনা ও সমাজ কাঠামো গড়ে ওঠার সুযোগ ছিল সীমিত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের ফলে বিভিন্ন কোমের মধ্যে যোগাযোগ, সংঘাত ও আদান-প্রদান শুরু হয় এবং কালক্রমে বৃহত্তর অঞ্চলগুলোকে ভিত্তি করে বিভিন্ন কোমের উৎপত্তি ঘটে। বঙ্গ, পুণ্ড্র,, রাঢ়, গৌড় প্রভৃতি জনপদের উৎপত্তি এই প্রক্রিয়ারই ফল।

বঙ্গ খুব প্রাচীন দেশ। মহাভারতেও বঙ্গের উল্লেখ রয়েছে। প্রাচীন পুঁথিতে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। অঙ্গ বলতে সাধারণভাবে বর্তমান বিহার এবং কলিঙ্গ বলতে বর্তমান উড়িষ্যাকে বোঝাত। বঙ্গ ছাড়াও সে যুগে এ অঞ্চলে যে সকল জনপদের অস্তিত্ব ছিল, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে পুণ্ড্র, রাঢ়, সুহম, সমতট ও হরিকেল। মোটামুটিভাবে বর্তমান ঢাকা বিভাগ ও বৃহত্তর বরিশাল (তৎকালীন নাম চন্দ্রদ্বীপ) অধিকাংশ সময়ে বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ জনপদের সীমা কখনও কখনও পূর্বে ও পশ্চিমে আরও বিস্তৃত হয়েছে। মোটামুটিভাবে বর্তমান রাজশাহী বিভাগ তথা উত্তর বঙ্গ নিয়ে তৎকালীন পুন্ড্র জনপদ গঠিত ছিল। গুপ্ত যুগে এটি পুণ্ড্রবর্ধন নামে গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি ভুক্তিতে পরিণত হয়। তদানীন্তন পুন্ড্রের রাজধানী ছিল বর্তমান বগুড়া জেলার মহাস্থান। পুণ্ড্রবর্ধনের মূল ভূখন্ড এক সময়ে 'বরেন্দ্র' নামে অভিহিত ছিল।

বৃহৎসংহতি ও পুরনো পুঁথিপত্রে 'উপবঙ্গ' নামে একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এক সময় উপবঙ্গ বলতে বর্তমান বৃহত্তর যশোর জেলা ও তার আশে পাশের এলাকাকে বোঝানো হত। 'প্রবঙ্গ' নামে একটি জনপদেরও অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এর সঠিক অবস্থান জানা যায় না। একাদশ শতকের শেষদিকে 'উত্তর বঙ্গ' ও 'অনুত্তর বঙ্গ' নামে বঙ্গের দু'টি ভাগ কল্পিত হয়েছিল। পদ্মা ছিল এই দু'টি ভাগের সীমানা।

পুরানো পুঁথিপত্রে 'সমতট' নামের একটি জনপদের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমতট ছিল কামরূপের দক্ষিণে। বর্তমান আসাম ও মেঘালয় রাজ্যের প্রাচীন নাম কামরূপ। বর্তমান বৃহত্তর কুমিল্লা ও নোয়াখালি জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা রাজ্য সমতটের অংশ ছিল। সমতটের দক্ষিণে ছিল হরিকেল। প্রাচীন পুঁথি অনুযায়ী এ জনপদটি ছিল চন্দ্রদ্বীপ সংলগ্ন। সে থেকে ধারণা করা যায়, বর্তমান বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলা ছিল হরিকেলের অংশ।

মোটামুটিভাবে ভারতের পশ্চিম বঙ্গ রাজ্যের দক্ষিণাঞ্চল নিয়ে গঠিত হয়েছিল প্রাচীন রাঢ় জনপদ। এ জনপদের উত্তরাংশ বজ্রভূমি ও দক্ষিণাঞ্চল সুহমভূমি নামে পরিচিত ছিল। বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি মহকুমা, সাঁওতালভূমিসহ সমগ্র বীরভূম জেলা এবং বর্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমা নিয়ে গঠিত ছিল উত্তর রাঢ়। বর্ধমান জেলার দক্ষিণাংশ, হুগলি জেলার বহুলাংশ এবং হাওড়া জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ রাঢ়। মহাভারতে, জাতকের গল্পে, বৌদ্ধ পুঁথিতে ও বিদেশী পর্যটকদের বর্ণনায় তাম্রলিপ্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। সুহমভূমিতেই অবস্থিত ছিল বিখ্যাত তাম্রলিপ্তি বন্দর।

কোটিল্যের অর্থ-শাস্ত্রে, বাৎস্যায়নের রচনায় ও অন্যান্য গ্রন্থে গৌড়ের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। মোটামুটিভাবে বর্তমান মুর্শিদাবাদ-বীরভূমই ছিল প্রাচীন গৌড়ের মূল ভূখন্ড। গৌড়ের আধিপত্য কখনও কখনও পার্শ্ববর্তী জনপদসমূহ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে।

পুণ্ড্র এবং গৌড়ের অধীনে সমগ্র বাংলাকে একত্র করার প্রয়াস সফল হয়নি। যে বঙ্গ ছিল আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির চোখে ঘৃণা ও অবজ্ঞার বিষয়, অবশেষে সে 'বঙ্গ' নামেই বাংলার সকল জনপদ ঐক্যবদ্ধ হল পাঠান আমলে। চতুর্দশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সুলতান শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ নিজেকে 'শাহ-ই-বাঙ্গালাহ,' হিসেবে ঘোষণা করেন। কিন্তু তাঁর রাজধানী ছিল 'লাখনৌতি' বা 'লক্ষণাবতী' বা গৌড়ে। আবুল ফজল তাঁর 'আইন-ই-আকবর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'বঙ্গ' শব্দের সঙ্গে 'আল' যুক্ত হয়ে 'বাঙ্গালা' হয়েছে। 'আল' বলতে শুধু ক্ষেতের আল নয়, ছোট বাঁধও বোঝায়। চাষের জমিতে পানি ধরে রাখার জন্যই আল বা বাঁধের প্রয়োজন হয়। শব্দটিতে বাংলাদেশের কৃষি নির্ভরতা ও নদীমাতৃকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। মোগল আমলে এ অঞ্চলকে বলা হত 'সুবা বাঙ্গালাহ'। বস্তুত বঙ্গ থেকেই 'বাঙ্গালা', ফারসি 'বাঙ্গালাহ' পর্তুগিজ 'বেঙ্গালা', ইংরেজী 'বেঙ্গল', এবং আমাদের ভাষায় 'বাংলা'ও 'বাংলাদেশ' শব্দের উৎপত্তি হয়েছে।

নৃতাত্ত্বিক পরিচয়

বাংলাদেশের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে যে নরগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশী, তা হল 'আদি-অস্ট্রেলীয়' বা 'ভেড়ডিড'। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সঙ্গে চেহারার মিল থাকায় এদের বলা হয় 'আদি অস্ট্রেলীয়'। আর শ্রীলঙ্কার ভেড়ডাদের মত দেখতে বলে এদের নৃতাত্ত্বিক নাম 'ভেড়ডিড'। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল, 'দ্রাবিড়' বা 'আর্য' আসলে নরগোষ্ঠীর নাম নয়, ভাষাগোষ্ঠীর নাম। একই নরগোষ্ঠীর মধ্যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভাষার প্রচলন দেখা যায়। কাজেই ভাষা দিয়ে নরগোষ্ঠীর নাম করলে

বিভ্রান্তি সৃষ্টির অবকাশ থাকে, যদিও নৃতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সঙ্গে ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়।

বাংলাদেশের জনগোষ্ঠির মধ্যে আরেকটি রক্তের ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় এবং তা হচ্ছে মঙ্গোলীয়। বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে মঙ্গোলীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব সবচাইতে বেশী, তাদের বলা হয় প্যারোইয়ান। পার্বত্য চট্টগ্রামের উপজাতীয়দের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তধারার মালয়-ইন্দোনেশীয় উপগোষ্ঠীর প্রভাব যথেষ্ট। বিভিন্ন ভূপ্রকৃতি ও জলাবায়ুতে মানুষের বিচিত্র জীবনপ্রবাহ তাদের চেহারায় এমন বৈচিত্র এনেছে যে, কোন্ রক্তধারা কোথায় কতটুকু মিশেছে, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে 'ইন্দো-আর্য' নামে পরিচিত ককেশীয় জনগোষ্ঠী উত্তর পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে এ উপমহাদেশে প্রবেশ করে। পরবর্তীকালে এরা উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে এখানকার আদিম অধিবাসীদের সঙ্গে মিশে যায়। 'উচ্চবর্ণের' লোকদের মধ্যে এই নরগোষ্ঠীর চেহারার প্রভাব লক্ষ্যণীয়। তবে, ভেড্ডিশি ও মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব বাংলাদেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর মধ্যে নেহাত কম।

ইন্দো-আর্যদের আগমনের পর পরই সম্ভবত তুর্কিস্তান এলাকা থেকে শক জাতির লোকেরা ভারতবর্ষে অভিযান চালায়। তারা উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে, বিশেষত দক্ষিণ ও পূর্ব ভারতে ছড়িয়ে পড়ে এবং কালক্রমে অন্যান্য জাতির সঙ্গে মিশে যায়। নৃতাত্ত্বিকদের মতে, এদেশের 'উচ্চবর্ণে'র লোকদের গোল মাথার মূলে রয়েছে এই শক জাতীয় উপাদান।

বাংলার বাইরের অনেক পরাক্রমশালী রাজা ও সেনাপতি বিভিন্ন সময়ে এদেশ আক্রমণ করেছে। তাদের সঙ্গীদের অনেকে হয়ত এদেশে স্থায়ীভাবে থেকে গেছে এবং কালক্রমে বৃহত্তর জানগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে গেছে। রাজপুত্রদের মধ্যে বিদেশী রাজকন্যা বিয়ে করার প্রচলন ছিল। এক্ষেত্রে বর্ণের বালাই ছিল না। এভাবেও বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর রক্ত এসে মিশেছে। তুর্কি বিজয়ের পরও বাংলাদেশে কিছু ভিন্ন রক্তধারার স্পর্শ লেগেছে। বাংলাদেশে কয়েকজন হাবসি সুলতান রাজত্ব করেছেন। তাছাড়া হাবসি প্রহরী রাখার প্রচলনও এক সময় ছিল। এদের রক্ত মিশেছে এই জাতির মধ্যে। মধ্যযুগে মুসলিম সুফি-সাধকরা এসেছেন সুদূর আরব থেকে। তাঁদের সঙ্গীরাও এসেছেন। দেশের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে এসেছেন আরবি সওদাগররা। এর ফলে এই জাতির মধ্যে কিছু ভূমধ্যসাগরীয় রক্ত মিশে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। মগ জলদস্যুদের উৎপাতে এক সময় অতিষ্ঠ ছিল বাংলাদেশের উপকূলীয় জীবন। এদের মাধ্যমে কিছু মগ রক্ত সঞ্চারিত হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের দৈহিক কাঠামো বিশ্লেষণ করলে প্রতীয়মান হয় যে, আদি-অস্ট্রেলীয় অর্থাৎ ভেড্ডিড বৈশিষ্ট্যই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর মৌলিক ও প্রধান উপাদান। পরবর্তীকালে বিভিন্ন কারণে ও পরিস্থিতিতে তাতে অল্পবিস্তর মঙ্গোলীয়, ইন্দো-আর্য ও শক-পামিরীয় উপাদান এসে মিশেছে। সাধারণভাবে বাংলার পশ্চিমাঞ্চলে ইন্দো-আর্য ও শক। পামিরীয় উপাদান এবং পূর্বাঞ্চলে মঙ্গোলীয়

প্যারোইয়ান ও মালয়-ইন্দোনেশীয় প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এ বিচিত্র মেলামেশার ফলে শংকর জাতি হলেও এদেশের মানুষের দেহের একটি নিজস্ব গঠন দাঁড়িয়ে গেছে।

ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ

আদি অস্ট্রেলীয় নরগোষ্ঠীর মুল ভাষা ছিল 'অষ্ট্রিক'। স্বাভাবিকভাবে এদেশের আদি অধিবাসীদের ভাষা ছিল অষ্ট্রিক পরিবারভুক্ত। আজও আমাদের ভাষায় 'কুড়', 'পণ', 'গন্ড', 'গুঁড়ি'. 'গুঁটি', প্রভৃতি যেসব শব্দ প্রচলিত হয়েছে সেগুলো অষ্ট্রিক ভাষারই দান। দৈহিক পরিবর্তনের তুলনায় ভাষার পরিবর্তন হয় অনেক দ্রুত। কারণ, ভাষা অনেক বেশী গতিশীল ও প্রবহমান। বিজয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতি বিজিত সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে অনেকাংশে বদলে দেয়। সভ্যতা-সংস্কৃতির প্রধান বাহন হচ্ছে ভাষা। কালের বিবর্তনে বিভিন্ন নরগোষ্ঠীর লোক এদেশে এসেছে। তাদের প্রভাবে এদেশের জনগোষ্ঠীর ভাষা ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েছে।

যে বৈদেশিক ভাষা প্রবাহ বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিকে প্লাবিত করেছে, তা হল ইন্দো-আর্য ভাষা। এ ভাষার আদি পরিশীলিত রূপ 'সংস্কৃত'। সাধারণ জনগোষ্ঠীর ব্যবহারে এই ভাষা রূপ নিয়েছে 'প্রাকৃত' বা স্বাভাবিক জনভাষা হিসেবে। এই প্রাকৃত ভাষা উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, শৌরসেনী, মাগ্‌ধী, অর্ধমাগ্‌ধী, পৈশাচী। মাগ্‌ধী-প্রাকৃত থেকেই বর্তমান বাংলা ভাষার উৎপত্তি হয়েছে বলে অনেক ভাষাবিদ মনে করেন। স্বাভাবিকভাবেই এ ভাষায় গৃহীত হয়েছে আদি অষ্ট্রিক ভাষার অনেক শব্দ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, আর্যভাষী লোকেরা ভারতে আধিপত্য বিস্তারের সময় এখানকার আদিবাসীদের ব্যবহৃত দ্রাবিড় ভাষার অনেক শব্দ আর্য-ভাষায় আয়ত্ত করে নিয়েছিল। আর্য-ভাষার মাধ্যমে এমন অনেক দ্রাবিড় শব্দও বাংলায় এসেছে।

লক্ষ্যণীয় যে, আর্য ভাষীরা বাংলায় খুব একটা বসতি স্থাপন না করলেও তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি এদেশে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এর প্রধান কারণ, সংস্কৃত ছিল রাজভাষা। পরবর্তীকালে মুসলিম আমলেও রাজভাষা ছিল ফারসি। উল্লেখ্য, ফারসিও ইন্দো-আর্য তথা ইন্দো-ইরানীয় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

উপসংহার

প্রাচীনকালে বিভিন্ন কৌম মিলে যেসব জনপদ গড়ে উঠেছিল, সেগুলো একত্র করার জন্য বিভিন্ন সময় শক্তিশালী শাসকবর্গ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কৌম সমাজ স্থানীয় জনপদের সত্তাকে বৃহত্তর দেশসত্তায় মিলিয়ে দিতে আগ্রহী ছিল না। এদেশের মানুষের হৃদয়াবেগ, প্রাণধর্ম ও ইন্দ্রিয়ালুতার উৎসও হল সেই আদিম কৌম সমাজ। সাংসারিক জীবন ও পারিবারিক বন্ধনের প্রতি নাড়ির টান, রূপ-রস-গন্ধের প্রতি গভীর আসক্তি, বেদান্তে বিরাগ, শুষ্ক জ্ঞানার্জনের প্রতি অনাগ্রহ এসব এসেছে কৌম সমাজ থেকেই। এই চরিত্র একদিকে যেমন আমাদের শক্তি অন্যদিকে তেমনি দুর্বলতা হিসেবে প্রতিভাত হয়েছে। শাসকবর্গ আর সাধারণ মানুষের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে দুস্তর ব্যবধান। একদিকে সমাজের সাধারণ স্তর হয়েছে একান্তভাবে ভূমি ও

কৃষিনির্ভর, অপরদিকে শাসকবর্গ অভ্যস্ত হয়েছে ভিন্নতর সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায়। রাষ্ট্রনায়ক ও সমাজপতিদের প্রতি সাধারণ মানুষের আগ্রহ ও আস্থা দেখা গেছে নিতান্তই কম। বৈদেশিক আক্রমণের মুখে শাসকবর্গের নেতৃত্বে জনসাধারণের ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ খুব কমই ঘটেছে। ফলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী ও ভাষা পরিবারের সভ্যতা ও সংস্কৃতি মিলে একাকার হয়েছে এদেশের আদি অধিবাসীদের জীবনযাত্রার সঙ্গে।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রকৃতপক্ষে বাংলাদেশ, বাংলা ও বাঙালীর উৎস অনুসন্ধান করা হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বা ও রাষ্ট্রসত্ত্বা এক নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, একই নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী, ভাষা ও সংস্কৃতির মানুষ বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরেও রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তারাও অভিন্ন ঐতিহ্যের অংশীদার। কিন্তু যে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটিয়েছে, সেগুলো সময়ের বৃহত্তর পরিসরে সাম্প্রতিক হলেও স্বতন্ত্র জাতিসত্ত্বা বিকাশে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্ত্বশাসনের সংগ্রাম এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ আমাদের দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধকে তীব্রতর করেছে এবং স্বাধীন সত্ত্বার অন্বেষণে আমাদেরকে অনুপ্রণিত করেছে। স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশে পরিণতি দিয়েছে।

জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্বের উৎস অনুসন্ধান, জাতিসত্ত্বার লালন ও বিকাশে অবদান রাখবে। এটি একদিকে গবেষণার বিষয়, অপরদিকে অনুভূতির। ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা আমাদের জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করতে সহায়ক হবে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে, জাতীয় সংস্কৃতি (national culture) হচ্ছে মুল স্রোতধারা (dominant culture) এবং অপরাপর সংস্কৃতি (sub-culture) এর সমষ্টি। পূর্বোক্ত রচনায় খুশবন্ত সিং বলেছেন "I am convinced that our guaranteed diversity is our strength as a nation." বাংলাদেশের জনগোষ্ঠী ও সংস্কৃতি ভারতের মত এত বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। তা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে যে সীমিত বৈচিত্র রয়েছে, তাকেও বৃহত্তর অর্থে বাংলাদেশের জাতিসত্ত্বার অংশ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। সাম্য, স্বাধীনতা, সুবিচার, কল্যাণ ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ হবে আমাদের জাতিসত্ত্বার লালন ও বিকাশের উজ্জীবনী শক্তি।